বনিক বার্তা

প্রকাশ : ১১ ডিসেম্বর, ২০১৩ ০০:০০:০০

শিক্ষাব্যবস্থা

অধোগতির ধারা পরিবর্তন কি সম্ভব

অর্থনীতিক বিশ্লেষণে এ শিক্ষাবাজারে দুটো পথে নতুন স্থিতি আনা সম্ভব। যদি সনদপ্রাপ্তির প্রকৃত বাজার দাম শিক্ষাপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান ও অর্থপ্রাপ্তিতে সংকট (বা ঘাটতি) আনে এবং তা অভিভাবকদের চোখে দ্রুত ধরা পড়ে তাহলে শিক্ষাপ্রাপ্তির বর্তমান হিড়িক প্রশমন হবে এবং তা (চাহিদা হ্রাসের মাধ্যমে) শিক্ষা খাতে দক্ষতা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে। দ্বিতীয়, যদি শিক্ষার উপাদান ও ধরন মেধাবৃদ্ধির সহায়ক ও বাজারোপযোগী (কর্মসংস্থানে সহায়ক) হয়, সেক্ষেত্রে নতুন মাত্রায় শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হবে, যা শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে মেনে নিয়েই প্রয়োজনীয় মেধা তৈরিতে মনোযোগী হবে

সাজ্জাদ জহির

বহুদিন আগে বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে কয়েকজন স্কুলছাত্রীর সঙ্গে সৃজনশীল শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। সৃজনশীলতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা মুখস্থবিদ্যাকে ফটোকপিয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম। তবে দুটোর মাঝে কিছুটা ফারাক আছে। কোনো বিষয়বস্তু মুখস্থ করতে আমাদের সচেতন প্রয়াস নিতে হয়। অনেক সময় সেই প্রয়াস-প্রক্রিয়ায় আমাদের মস্তিষ্কে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম (পূর্বলেখন) দাঁড়িয়ে যায়, যা বেশ সহজাতভাবে, যেন অজান্তে মস্তিষ্ককে এড়িয়ে, দৃষ্টি (স্ক্যানিং বা ইমেজিং) ও বচনে (প্রিন্টিং) সরাসরি সংযোগ তৈরি করে। ফটোকপিয়ারের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এই প্রোগ্রামিং যত নিখুঁত হয় এবং ব্যক্তিমস্তিষ্কের ব্যবহার যত কম হয়, ততই নির্ভুল অনুলিখন সম্ভব। সৃজনশীলতার পরিমাপে ফটোকপিয়ারের প্রাপ্তি যদি সর্বনিম্ন (শূন্য) হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাবেন সর্বাধিক। এ দুয়ের মাঝে বিশাল ফারাক, যেখানে নানারূপে ও কাতারে আমাদের অবস্থান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সৃজনশীলতার সরাসরি সম্পর্ক আছে কি নেই, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীল নাকি ফটোকপিয়ারে রূপান্তর করছে, তা ভেবে দেখা জরুরি। সাধারণ শিক্ষায় মুখস্থবিদ্যার প্রাধান্য ও বিস্তার সন্দেহাতীতভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়। সত্যি বলতে কী, বিকারহীন মনুষ্য শরীরে বোমা বিস্ফোরণের দৃশ্য স্মরণ করলে এই শিক্ষাধারার সম্ভাব্য অশুভ ফলশ্রুতি শঙ্কা জাগায়। সে বিষয়ে দৃষ্টিগোচরের উদ্দেশ্যেই মূলত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে আলোচনায় রেখে এ নিবন্ধের অবতারণা।

ছয় বছর আগে একটি ইংরেজি দৈনিকে 'ইন সার্চ অব এ ব্রেইন ইন দ্য বডি' (শরীরের ভেতর মস্তিষ্কের সন্ধানে) শীর্ষক একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম। কথা প্রসঙ্গে সেখানে উল্লেখ করেছিলাম যে, প্রযুক্তির অগ্রগতি যে ধারায় ঘটেছে, তা মানবসমাজে মস্তিষ্কের (স্বাধীন মনন প্রক্রিয়ার) আপেক্ষিক চাহিদা কমিয়ে (শ্রমের বিকল্পস্বরূপ) যন্ত্র বা যন্ত্ররূপী মানুষের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন কৃত্রিম মেধা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) তৈরিতে বিজ্ঞান সাধনায় অনেক বিনিয়োগ হতো। তবে ব্যক্তি যখন নিজের খরচেই নিজ তাগিদে জৈবিক যন্ত্রে রূপান্তর হতে চায়, কৃত্রিম মেধা তৈরিতে বিনিয়োগের প্রয়োজন থাকে না। বাজারের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, স্বেচ্ছায় মানসিক দাসত্বকে আমরা মেনে নিয়েছি! এ দাসত্বের একটি প্রকাশ ঘটে যখন আমাদের কর্ম ও প্রতিক্রিয়া বহিঃনিয়ন্ত্রিত হয়, যা পূর্বলেখন (প্রোগ্রামিং) করা যন্ত্ররূপী মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই ফটোকপিয়ার তৈরি করতে ব্যর্থ হলেও 'শিক্ষিত'দের নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিংয়ের নিয়ন্ত্রণে আনতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

ইতিহাসের ছিটেফোঁটা

মানবজ্ঞানের পরিসীমা যখন তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল এবং সেই জ্ঞানের পরিধি যখন অনেকাংশেই ব্যক্তিমানসের ধরাছোঁয়ার আওতায় ছিল, শিক্ষার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন; সঙ্গত কারণে আশ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রাধান্য ছিল। অর্থাত্ একই গুরুর সান্নিধ্যে কিছুকাল থেকে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা থাকত। মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্বেই অথবা গ্রিক সভ্যতার শীর্ষকালে শিক্ষকতায় কিছুটা বিশেষজ্ঞায়নের (স্পেশিয়ালাইজেশন) নিদর্শন পাওয়া যায়। একই শিষ্যকে একাধিক গুরুর আশ্রমে কিছুকাল কাটানো তারই প্রকাশমাত্র। সেসব আজ অতীত, এমনকি পঞ্চম দশকে গড়ে ওঠা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য বিদেশী আগ্রাসনে বিলীন হয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনঃস্থাপন ও সমান্তরালভাবে আফগান ও মোঙ্গল সূত্রে মুসলমান শাসনকালে এই উপমহাদেশে সংস্কৃত ও ফারসিকেন্দ্রিক দ্বিধারার মৌলিক শিক্ষা মূলত ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রসার পায়। পেশাভিত্তিক বা কারিগরি/ ব্যবসা শিক্ষা বহুলাংশেই পরিবারকেন্দ্রিক ছিল। উপনিবেশ আমলে স্বদেশের পক্ষে ধর্মকেন্দ্রিক অথবা গণসচেতন প্রয়াসী ক্লাব ঘিরে ভিন্ন শিক্ষার প্রয়াস থাকলেও বিশ্বপরিসরে সর্ববিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষার যে প্রসার ঘটে, এ উপমহাদেশ তার বাইরে থাকেনি। বরং ধর্মকেন্দ্রিক কাঠামো ব্যবহারের সুযোগ সীমিত থাকায় ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হিসেবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নব-আবিষ্কৃত স্কুল-কলেজভিত্তিক সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমাদের দেশেই বিগত শতাব্দীর শেষাবধি ন্যূনতম চার-পাঁচটি জেনারেশন গড়ে উঠেছে বহু শিক্ষক নিয়োগকারী প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেড়ে ওঠার উল্লেখজনক কয়েকটি বছর কাটিয়ে। এ ব্যবস্থার ফলে শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে এবং জনগোষ্ঠীর অনেককে এ ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়েছে।

তবে ক্ষোভ কেন?

বহু বছর গবেষণা কাজের সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা অনেক ছাত্রছাত্রীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে— বাইরে পড়তে যাওয়া বা কাজের বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশের প্রাক্কালে। নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তি পরিচিতি ব্যাপক; তবে অনেক ক্ষেত্রেই তা আংশিক এবং ফেসবুকজাতীয় সামাজিক নেটওয়ার্কে আবদ্ধ। বলতে দ্বিধা নেই, ক্রমান্বয়ে যেন ফটোকপিয়ারের বিস্তার দেখতে পাই। এ ব্যাপারে প্রথম হোঁচট খেলাম যখন, ছয়-সাত বছর আগে এমএ পরীক্ষায় প্রথম হওয়া জনৈক ছাত্র পাঠ্যপুস্তক লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে জানাল যে, তার 'নোট' পরবর্তী তিন-চার বছরের ছাত্রছাত্রীরা ফটোকপি করে নিয়মিত পড়ে আসছে এবং তার ভিত্তিতে পরীক্ষায় ভালো ফলও পাচ্ছে। এটা অনস্বীকার্য যে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুস্তিকার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একই যুক্তিতে বই পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়ায় শিক্ষকের দেয়া নোট অথবা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের উপস্থাপনার ভিত্তিতে তৈরি কোনো ছাত্রের নোটের চাহিদা বহুল মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

জ্ঞানের বিশাল সমুদ্রকে বিষয়ভিত্তিক খণ্ডন করে কিছু নির্যাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিছু মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এর আবশ্যিকতা সহজবোধ্য, কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে অনেক প্রায়োগিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্ভবত সেটা সত্য নয়। আমাদের কালে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কোনো শিক্ষক সুনির্দিষ্ট বই অনুসরণ করতেন, কিন্তু বিষয়ভিত্তিক আলোচনার জন্য আমরা ব্যক্তি ও দলপর্যায়ে পাঠাগারে ভিড় জমাতাম অথবা নতুন কিছু হঠাত্ পাওয়ার আশায় নীলক্ষেতের পুরনো বইয়ের দোকানে হাতড়ে বেড়াতাম। সে সময় অবশ্য শিক্ষা চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ ছিল না। নিঃসন্দেহে টেলিভিশনের ছড়াছড়ি ছিল না; তাই চলমান ঘটনা তাতক্ষণিকভাবে জানার সুযোগ ছিল না। ইন্টারনেটের অনুপস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। সম্ভবত সেসব কারণে পরিবার, পাড়া, কোনো এক মফস্বল শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত আড্ডাখানা এবং জাতীয় রাজনীতির শিক্ষাঙ্গনে পাঠ নেয়ার সুযোগ ছিল। অনস্বীকার্য যে, 'চর দখলে' ব্যস্ত আমাদের প্রজন্ম সেই বৃহত্তর শিক্ষাঙ্গনকে সংকুচিত করে সে শিক্ষা থেকে নতুনদের কেবল বঞ্চিতই করেনি, আমরা তাদের তথাকথিত সামাজিক নেটওয়ার্ক 'ফেসবুক' ও 'টুইটারে'র ভার্চুয়াল সাম্রাজ্যে ঠেলে দিয়েছি। এসবের মাঝে

কেবলমাত্র সনদপ্রাপ্তির জন্য (যা অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসন স্বপ্ন বাস্তবায়নকে সহজতর করে) স্বল্পকালের জন্য যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তাদের কাছে জ্ঞানার্জন বা তার অংশবিশেষ সম্পর্কে শিক্ষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা অনুপ্রেরণা নাও থাকতে পারে। অথবা সামগ্রিকভাবে প্রচলিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হয়তো নেই এবং সে কারণে তার প্রতি আগ্রহও কম। ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে বললে, এই সীমিত গণ্ডিতে নোট বইয়ের বেড়াজাল থেকে বেরোতে পারলেও পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষা নতুন প্রজন্মকে কতখানি জ্ঞানসমৃদ্ধ করতে পারবে? যদি সে শিক্ষা ফটোকপিয়ার তৈরি করে, কৃত্রিম মেধার বাজারেইবা তার মূল্য কতটুকু? আর ফটোকপিয়ার না হয়ে যদি কেউ ভ্রান্ত শিক্ষার কারণে পূর্বলেখনের বেড়াজালে আটকে পড়ে, তারইবা পরিণতি কী?

শিক্ষার বিপণন— সীমিত দৃষ্টান্ত

শিক্ষা যে পণ্যে রূপান্তর হয়েছে, সে ব্যাপারে সম্ভবত অধিকসংখ্যক ব্যক্তি একমত, যদিও তার সামগ্রিক অনুধাবন মুক্ত আলোচনায় সেভাবে পরস্ফুিট হয়নি। দুই মাস আগে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাজারে আসা নতুন এক টেক্সট বইয়ের সন্ধান পেলাম— সহকারী লেখকের/কন্ট্রিবিউটরের তালিকায় উত্তর আমেরিকা ও যুক্তরাজ্যের অনেক নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম দেখলাম। এদের দু-একজন পূর্বপরিচিত, তাই জানতে চাইলাম বইটি কেমন। একজন তো অবাক, বইটির নামই শুনেননি— কোনো একসময় হয়তো ই-মেইলের মাধ্যমে নাম তালিকাভুক্তির সম্মতি নেয়া হয়েছিল! বাজারজাতের উদ্দেশ্যে এ-জাতীয় কৌশল (স্ট্র্যাটেজি) হরহামেশাই দেখা যায়। অপর প্রান্তে, একটি ভালো পাঠ্যপুস্তক থাকলে জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত একজন শিক্ষকের শ্রমকষ্ট অনেকখানি লাঘব হয়। আমার জানা ছিল না যে, বহু দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিষয় নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের সারিবদ্ধ অধ্যায় অনুযায়ী পড়ানো হয় (কেউ চাইলে ইন্টারনেট ঘেঁটে আমার বক্তব্য যাচাই করতে পারেন)। এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে বিপাকে পড়লাম, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত অনেকেই স্মরণ করিয়ে দিলেন— বহু বছরের অভিজ্ঞতায় এ পাঠানুক্রম গড়ে উঠেছে, যার নিঃসন্দেহে ভিত্তি আছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত বন্ধুদের কাছ থেকে জানলাম যে, প্রতিষ্ঠিত পাঠ্যপুস্তকে চিহ্নিত একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর বাইরে তরুণ শিক্ষকদের বিচরণ করতে দিলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি! আরো পরে জেনেছি যে, ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকনির্ভর এ ব্যবস্থায় সহজ বোধ করে। সঙ্গত কারণেই পাঠ্যপুস্তককেন্দ্রিক ক্লাসরুম শিক্ষা স্থায়িত্ব পেয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অধিক গুরুত্ব অর্জন করেছে।

এ নিবন্ধ লেখার সময় জনৈকা শিক্ষাবিদ ডেবরা স্কটের ২০১২ অক্টোবরে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ দৃষ্টিগোচর হলো। সেখানে করপোরেট শক্তির হাতে মার্কিন উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। এর পাঁচটি দিকের শেষটিতে শিক্ষার্থীদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়। দুটি উপায়ে এই ধ্বংস প্রক্রিয়া কার্যকর করা হচ্ছে বলে লেখিকা উল্লেখ করেন— 'শিক্ষার মান এমনভাবে ধ্বংস করা হয়, যেন ক্যাম্পাসে কেউ সত্যিকার অর্থে চিন্তা করতে, প্রশ্ন করতে বা যুক্তিবাদী হতে না পারে। এসবের পরিবর্তে তারা আদেশ মানতে, নিয়ম অনুসরণ করতে এবং খামখেয়ালিপনা ও তিরস্কার সহ্য করতে শিখছে।' লেখিকা শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে ফাস্টফুড রেস্তোরাঁর উতপাদন প্রক্রিয়ার সাদৃশ খুঁজে পান। পণ্যে রূপান্তরের এ প্রক্রিয়ায় মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে ঋণদানকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের আঁতাতের কথাও লেখিকা উল্লেখ করেন। শিক্ষার মানের নিম্নমুখিতা এবং সেই সঙ্গে যুক্তি-চিন্তার প্রতি বিমুখতার প্রসার যে সর্বজনীন রূপ নিয়েছে, তা আরো অনুধাবন করলাম যুক্তরাজ্য ও উত্তর আমেরিকার কিছু শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনাকালে। ডেবরার বক্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পেলাম যখন জানলাম যে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে আসা পিএইচডি পড়ুয়া বা উচ্চশিক্ষিত অভিবাসনকারীদের অতি নগণ্য মজুরিতে নিয়োগ দিয়ে একেকটি ক্লাসে ১৫০-২০০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে পড়ানোর যে ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তা মনন বিকাশে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। শেষোক্ত দৃষ্টান্ত বিশদ ঘাঁটলে বহুমাত্রিক আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে অর্থ ও মেধা পাচার, জ্ঞানের নামে অজ্ঞানতার পুনরুতপাদন ও ফিরতি অভিবাসনের মাধ্যমে তার বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ ইত্যাদি। [অনেক তরুণ শিক্ষক আমার মন্তব্যে মর্মাহত হতে পারেন। বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি নিজেও কথিত পুনরুতপাদন প্রক্রিয়ায় অবদান রেখে এসেছি।] শিক্ষাব্যবস্থার অধোগতির ধারা পরিবর্তন আদতেই সম্ভব কিনা, তা ভিন্ন পরিসরে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে এবং তার প্রাসঙ্গিকতা সর্বজনীন। সে আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই এ নিবন্ধ শেষ করব।

শিক্ষাপণ্যের বাজার, অনাকাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য ও সম্প্রসারিত শিক্ষায় লুপ্তপ্রায় জবাবদিহিতা

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল খুলনার একটি মিশনারি স্কুলে পড়বার, যেখানে ইতালি থেকে আসা জনৈক ফাদার ব্রুনো হেডমাস্টার ছিলেন। অধিকাংশ শিক্ষক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের উন্নতির জন্য নিজেদের ব্যক্তিজীবনের অনেক কিছুই হয়তো ছাড় দিয়েছিলেন। স্মরণ করলে আশ্চর্য লাগে যে, সে সময় ক্ষেত্রবিশেষ ব্যতিরেকে, অভিভাবক-শিক্ষক মিটিংয়ের প্রয়োজন ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর মূল্যায়নের অধুনা চল সে সময় কল্পনাতীত ছিল। সরকারি

উদ্যোগের বাইরে সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠাতা এবং শিক্ষককুল তাদের সর্বাত্মক ঢেলে দিয়েছেন, বাড়তি খবরদারির কথা মনে পড়ে না। অধিক সম্প্রসারিত শিক্ষাব্যবস্থায় আজকের অবয়বটা ভিন্ন।

উল্লিখিত ডেবরা স্কটের করপোরেট চক্রান্তে শিক্ষা ধ্বংসের তত্ত্ব না মানলেও এবং প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি সাধনের ফলে সৃজনশীল মেধার আনুপাতিক চাহিদার অস্বাভাবিক হ্রাসের কল্পকাহিনী যদি কেউ অস্বীকারও করেন, আজকের শিক্ষাঙ্গনে (বিশেষত ব্যক্তিমালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে) ন্যূনতম নিম্নোক্ত চারটি গোষ্ঠীর উপস্থিতি সবাই মেনে নেবেন—

-শিক্ষা জোগানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও তাদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক/কর্তৃপক্ষ;

-অধ্যাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, যারা মূলত কর্মজীবী (ভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের কারণে প্রশাসনের ভূমিকা এখানে উল্লেখ করছি না);

-অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী এবং

-শিক্ষার ব্যয় বহনকারী ব্যক্তি, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজেই খরচ বহন করেন, আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবক বা মা-বাবা এ খরচ বহন করেন।

এর বাইরে আরো দুটো গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে— পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশনা ও বিতরণসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী, যা অনেক ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণে; এবং ডেবরা-উল্লেখিত শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আন্তর্জাতিক করপোরেট খাতের প্রভাব, যা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য নয়। বাকি আলোচনায় এদেরকে অনুহ্য রাখব। মূলত বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনার ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে শিক্ষাকে সৃজনশীল করার দিকগুলো আলোচনায় আনব।

দেড়-দুই যুগ ধরে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। অনেকে হয়তো মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি)-কে কৃতিত্ব দেবেন। অন্যরা হয়তো বলবেন যে, শ্রম নিয়োগ নিশ্চিত করতে যে পুঁজির বিকাশ এ দেশে ঘটা প্রয়োজন ছিল, তা না হওয়ায় এক বিশাল জনগোষ্ঠী ব্যক্তি ও পরিবার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিতকল্পে শিক্ষাকেই মুখ্য অবলম্বন হিসেবে দেখেন। সেই চাওয়াটা অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে বিদেশে শ্রম রফতানি করে আয়প্রাপ্তির ফলে। পেছনের দিকে তাকালে মনে হয়, গোল্ডেন জিপিএ, দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশী লেবাসের শিক্ষা সনদপ্রাপ্তির সহজলভ্যতা; এবং সেই সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা একত্রে আগুনে ঘি দেয়ার মতো কাজ করেছে। ব্যাখ্যা না করেই বলব, গৃহ বা অ্যাপার্টমেন্ট খাতে যেমন (যুক্তরাষ্ট্রে) মূল্যবৃদ্ধির হিড়িক পড়েছিল (যাকে অনেকে হাউজিং বাবল/বুদ্বুদ আখ্যায়িত করেন), অথবা শেয়ারবাজারে সর্বস্তরের জনগণ তাদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় যেমন অতিমুনাফার লোভে ঢেলে দিয়েছিলেন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সাধারণ শিক্ষাকে নিয়ে তেমনি এক হিড়িক পড়েছে। এ হিড়িকে অভিভাবক ভালো ফল দেখলেই খুশি, কম পরিশ্রমে পরীক্ষায় ভালো করতে পারলে শিক্ষার্থীরাও খুশি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে মুনাফা নিশ্চিত হলে কর্তৃপক্ষও খুশি। এসবের মাঝে ছাত্রছাত্রীর মূল্যায়নে টিকে থেকে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে ও কোর্সের চাপ সইতে একজন শিক্ষকের যা যা করণীয়, সম্ভবত সেসবই তিনি করেন। একটি সনাতনী টেক্সট বই এবং তা যদি নামকরা কিছু পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের লেখা হয়, শিক্ষকতায় পড়ানোর শ্রম অনেকাংশেই লাঘব করে। ছাত্রছাত্রীরা যদি সেটার প্রয়োজনীয় অংশ মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালো ফল পেতে পারে, তবে তো সোনায় সোহাগা। সব সামাজিক ও অর্থনীতিক শক্তিগুলো বর্তমান ভারসাম্যে ভূমিকা রেখেছে, যে ভারসাম্যে অগণিত ফটোকপিয়ার তৈরি হচ্ছে! পূর্বলেখনের কথা উল্লেখ করেছিলাম, যার সঙ্গে নোম চমস্কির প্রতিবোধন (ইনডক্ট্রিনেশন) তত্ত্বের সাদৃশ রয়েছে। স্বল্প অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে যে, আমাদের নতুন প্রজন্মের পূর্বলেখন বা প্রতিবোধন ভিন্ন সূত্র থেকে হচ্ছে এবং বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্যহীনতাই সে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। সম্ভবত শিক্ষাঙ্গন থেকেই তার প্রতিরোধের সূত্রপাত হবে! সে বিশাল আলোচনা এ নিবন্ধে করা সম্ভব নয়।

আবারো শিক্ষাপণ্যের বাজারে ফেরা যাক! শিক্ষার সনদপ্রাপ্তিকে মানবসম্পদ উন্নয়নের সমার্থক গণ্য ও অতীতের আলোকে শিক্ষা বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্তির হার বেশি মনে করলে উচ্চশিক্ষার চাহিদা তেজি থাকাটাই স্বাভাবিক। সন্দেহাতীত যে, নিয়ত সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে আজ অবধি উচ্চশিক্ষিতদের সহজে কর্মসংস্থান হওয়ায় বর্তমানের এ ভারসাম্য পরিবর্তনের তাগিদ অনুভূত হয়নি। যদি এ ভারসাম্য মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে এবং আগামী দিনেও অর্থকরী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে, কারো কোনো ক্ষোভ প্রকাশের কারণ থাকবে না। কিন্তু ভেবে দেখুন, সেটা যদি না হয়, উচ্চশিক্ষার সনদপ্রাপ্ত বেকার তরুণদের বিক্ষোভ শেয়ারবাজারে ব্যর্থ জুয়ারিদের অসন্তোষের চেয়েও বহুগুণ অগ্নিমাখা হতে পারে! এ-জাতীয় ক্ষেত্রে পরিণতির পুনর্চিত্র দেখে পরিবর্তন আনতে চাইলে বিপরীত স্রোতধারা তৈরি অসম্ভব হতে পারে।

নিজস্বগতিতে বাজারে কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য ফিরে আসায় যারা বিশ্বাসী, তারা আমার আশঙ্কাকে অমূলক মনে করবেন। তথাপি নানা কথায় ব্যক্ত করেছি যে, উল্লিখিত ভারসাম্য অনাকাঙ্ক্ষিত এবং তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত নয়। অর্থনীতিক বিশ্লেষণে এ শিক্ষাবাজারে দুটো পথে নতুন স্থিতি আনা সম্ভব। যদি সনদপ্রাপ্তির প্রকৃত বাজার দাম শিক্ষাপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান ও অর্থপ্রাপ্তিতে সংকট (বা ঘাটতি) আনে এবং তা অভিভাবকদের চোখে দ্রুত ধরা পড়ে তাহলে শিক্ষাপ্রাপ্তির বর্তমান হিড়িক

প্রশমন হবে এবং তা (চাহিদা হ্রাসের মাধ্যমে) শিক্ষা খাতে দক্ষতা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে। দ্বিতীয়, যদি শিক্ষার উপাদান ও ধরন মেধাবৃদ্ধির সহায়ক ও বাজারোপযোগী (কর্মসংস্থানে সহায়ক) হয়, সেক্ষেত্রে নতুন মাত্রায় শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হবে, যা শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে মেনে নিয়েই প্রয়োজনীয় মেধা তৈরিতে মনোযোগী হবে। শেষোক্ত পথটি দেখার ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্নতা আছে, কেউ কেউ মনে করেন যে, ন্যূনতম কারিগরি দক্ষতা নিশ্চিত করে যদি মননশীল মানুষ তৈরি হয়, তা উপযুক্ত সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে ব্যক্তির সুব্যবস্থা করতে অনেক বেশি কার্যকর ও টেকসই ভূমিকা রাখবে। শেষোক্ত পথটি সবার কাম্য হলেও আগেই উল্লেখ করেছি যে, তা অর্জনের তাগিদ নানা কারণে অনুভূত নাও হতে পারে— পরনির্ভর বিকৃত শ্রমবাজার তার অন্যতম কারণ। সমাজের অগ্রজদের সে ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা প্রয়োজন। আমি মনে করি, অদূর ভবিষ্যতে এ হিড়িকের মাঝেই চলমান থেকে আমাদের নতুন পথ খুঁজতে হবে, যা শিক্ষার বিষয়বস্তুকে অধিক স্বদেশমুখী করবে এবং ব্যক্তিমানুষকে সৃজনশীল করবে। হয়তো দেশকে জানার প্রয়োজনীয়তা এখনো শেষ হয়নি এবং বিদেশে পাড়ি জমাতে হলেও আমাদের নতুন প্রজন্ম ফটোকপিয়ারের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে যেন মেধার জোরে দেশ ও জাতির মুখোজ্জ্বল করতে পারে। সেই আলোচনা ও পর্যালোচনা গঠনমূলকভাবে শুরু হোক— এটাই এ নিবন্ধের লেখকের মুখ্য কামনা।

রচনাকাল: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০১৩

লেখক: ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের সঙ্গে অর্থনীতিক গবেষণায় যুক্ত
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির খণ্ডকালীন অধ্যাপক

Print

দৈনিক বণিক বার্তা
সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল: news@bonikbarta.com বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ পিএবিএক্স: ৮১৮৯৬২২-২৩, ফ্যাক্স: ৮১৮৯৬১৯